তারিখ ... 22 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

এ সবই হচ্ছে একজন নির্বাহী অফিসারের যথেচ্ছার খামখেয়ালিপনা। তিনি হয়তো শিক্ষা প্রসারের বিরুদ্ধে। তাই তো ছাত্রছাত্রী আর গরু-ছাগলকে একই স্থানে পাঠদানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি এখন বামনা উপজেলায় নেই। কিন্তু যাওয়ার আগে কয়েকজনের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে গেছেন। এখন সেই মিথ্যা মামলায় নিরীহ ব্যক্তিরা হয়রানির শিকার। তিনি কেন এতটা নাখোশ বিদ্যালয়ের ওপর? তিনি কি চান তিনি একাই বিদ্বান থাকবেন আর সবাই ছাগল-গরু থাকুক? না হলে তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে আদালতের রায় উপেক্ষা করার এত দুঃসাহস পান কিভাবে?

ইসহাক খান ▷

# বিদ্যালয়ের মাঠে গরুর হাট কেন?

মূল লেখায় যাওয়ার আগে গরুর হাট নিয়ে নিজের জীবনের কিছু মজার কথা বলতে চাই। আমার জীবনে আমি দুবার মাত্র গরুর হাটে গিয়েছি। বাবার সঙ্গে একবার গরু বিক্রি করতে। আরেকবারও বাবার সঙ্গে কোরবানির জন্য গরু কিনতে। সেটা আমার ছোটবেলার কথা। তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র আমি।

সেই সময় গরুর হাটে যাওয়া মানে সারা দিনের প্রস্তুতি। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরত্বে হাট। হাটের নাম 'তালগাছি' হাট। বিরাট এলাকাজুড়ে হাট। ঢাকা থেকে শাহজাদপুর যেতে উল্লাপাড়া পেরোলে রাস্তার পাশে সেই বিখ্যাত হাট। সকালে গরম ভাত খেয়ে রওনা হয়ে হেঁটে পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর। তখন হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। দুপুরে খাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রুটি ভেজে নিয়ে যেতেন বড়রা। আমি হাটে ঘুরে ঘুরে গরম জিলাপি আর মোয়া-মুড়কি খেতাম। হাটে এত গরু আসত যে বিশাল এলাকাজুড়ে শুধু গরু আর গরু। তখন আশপাশে ১০-১২ কিলোমিটারের মধ্যে আর কোনো গরুর হাট ছিল না। রবিবার বসত হাট। হাটসংলগ্ন একটি হাই স্কুল। তালপাছি হাই স্কুল। সেই হাই স্কুলে আমার শ্বশুর দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মুখেই শোনা হাটের নানা কাহিনী। সেই সময় অবশ্য স্কুল-কলেজ, সরকারি অফিস-আদালত রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। কিন্তু হাটের পর দুই-তিন দিন ছাত্ররা স্কুলে আসত না। গরুর বর্জ্যে যে দুর্গন্ধ ছড়াত তাতে ক্লাস করা তো দূরের কথা, আশপাশে টেকা দায় হয়ে পড়ত।

এবার আসা যাক মূল গল্পে। বরগুনা জেলার বামনা উপজেলায় 'হলতা ডৌয়াতলা সমবায় বহুমুখী মাধ্যমিক' নামে একটি বিদ্যালয় আছে। ১০৬৮ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আট শতাধিক। দুঃখের বিষয়, সেই বিদ্যালয়ের মাঠে রবিবার বসে গরুর হাট। এবং স্কুলের মাঠে ঢোকার একটি সরু গেট। একই গেট দিয়ে গরু-ছাগল ও ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশ করতে হয়। শুধু তা-ই নয়, গরুর হাট বসার কারণে ছাত্রছাত্রীরা মাঠে অ্যাসেমব্লি পর্যন্ত করতে পারে না। হইচই চিল্লাচিল্লির মধ্যে ক্লাস করাও কঠিন হয়ে পড়ে। হাটের পরও দুই-তিন দিন ছাত্রছাত্রীরা মাঠ ব্যবহার করতে পারে না। খেলাধুলা তো দূরের কথা, স্কুলের আগে যে অ্যাসেমব্লি করার নিয়ম, সেটাও ছাত্রছাত্রীরা করতে পারে না।

মাঠের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে লারা ফাউন্ডেশন নির্মিত 'চির উন্নত শির' নামে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ। ২০১২ সালের ২৮ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রী এর উদ্বোধন করেন। প্রশ্ন হলো কে এই ফারিয়া লারা? লারা হলেন সেই মেয়ে, যিনি বাংলাদেশের বৈমানিক। প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে ঢাকার অদূরে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। তাঁরই নামে এই স্মৃতিস্তম্ভ। হাটের দিন এই স্মৃতিস্তম্ভের চারদিকে গরু-ছাগল বেঁধে এর পবিত্রতা নষ্ট করা হয়। মাঠের পশ্চিম পাশে লারা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত কর্মজীবী নারী-কিশোরী ছাত্রীনিবাস রয়েছে। বিদ্যালয় মাঠে হাট বসলে ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। মাঠের দক্ষিণ পাশে রয়েছে হলতা ডৌয়াতলা ওয়াজেদ আলী খান ডিগ্রি কলেজ। এই কলেজে এক হাজারের মতো শিক্ষার্থী। গরু-ছাগলের হাটের কারণে তাদের লেখাপড়ার চরম ব্যাঘাত ঘটে। এই হাটের কারণে বিদ্যালয় ও কলেজ আঙিনায় কোনো বৃক্ষরোপণ করে তা রক্ষা করা যায় না।

এর আগে এই হাট বসত ডৌয়াতলা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে। পরিবেশদূষণের কারণে পরিষদ কর্তৃক বাধা দেওয়ায় বিদ্যালয় মাঠে হাট বসানোর চেষ্টা করলে বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা গত বছরের ২৬ জুন মানববন্ধন করে। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি হলে এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেই উপজেলা পরিষদ ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২১ জুলাই ২০১৬ তারিখে একটি সমঝোতা চুক্তিপত্র নিজ নিজ পক্ষে স্বাক্ষর করা হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চুক্তির শর্ত মানলেও উপজেলা পরিষদ তারা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

বিদ্যালয়ের পেছনের জমিতে বাজার সম্প্রসারণ করার জন্য ২০০৯ সালে চেষ্টা করলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করে। যার নম্বর ৩১/২০১২। ২৬ জুন ২০১৫ তারিখ বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ মামলার রায় দেন। রায়ের ২৫ পৃষ্ঠায় বলেন যে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাজার সম্প্রসারণের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু জমি প্রদান করে তারপর বাজার সম্প্রসারণে প্রদান করার জন্য মামলার এক নম্বর বিবাদী জেলা প্রশাসককে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়।

জেলা প্রশাসক ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বামনাকে উল্লিখিত বিষয়টি ফয়সালা করার জন্য আদেশ দিলে তিনি কোনো সুরাহা না করে কালক্ষেপণ করতে থাকেন। শুধু তা-ই নয়, এই নির্বাহী অফিসার নানাভাবে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি ২-১০-২০১৬ সালে ৪৫ বছর আগে নির্মিত ও ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের আবাসিক ভবনের সহকারী শিক্ষক মো. নাসির উদ্দিনকে অপসারণ করে সরকারি বাজারের অবৈধ জমি পুনর্দখলের জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত করা হবে মর্মে (স্মারক নম্বর ০৫/১০/০০৮/০১/১৩/৪৬২) একটি পত্র প্রেরণ করেন। এ সবই তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশের প্রতিফলন।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, বিদ্যালয়ের আবাসিক ভবনের ৩১ দাগের .০৮ শতক জমির ব্যক্তিমালিক দীর্ঘদিন আগে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করার জন্য মৌখিকভাবে দান করেছিলেন। অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্ত করার দাবিতে মি. সুখরঞ্জন দায়েরকৃত ৭৫/১৬ নম্বর মামলাটি বামনা সহকারী জজ আদালতে চলমান। মামলায় ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজস্ব ও সহকারী কমিশনার ভূমি, বামনার ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তের প্রার্থনা মতে—টিল ফারদার অর্ডার পর্যন্ত অত্র অ্যাবসুলেট দরখাস্ত মঞ্জুর করা হলো। অথচ ২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে আকস্মিকভাবে অবৈধ দখলে থাকা সরকারি বাজার শ্রেণির জমিতে নির্মিত স্থাপনা অপসারণের নোটিশ শিরোনামে—এ ছাড়া আপনাকে অত্র পত্রপ্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে তা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হলো। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাহী অফিসারের পত্রের জবাব দেওয়া হয়। অথচ উপজেলা চেয়ারম্যানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে উল্লিখিত গরুর হাট স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবিত নিচু জমি ভরাট করার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

উপরন্তু নির্বাহী অফিসার মাস্তান লেলিয়ে দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছেন। ১৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ গভীর রাতে জনৈক রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের গেট বরাবর সাতটি দোকান নির্মাণ করা হয়। ফলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং বের হওয়ার পথও প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

এ সবই হচ্ছে একজন নির্বাহী অফিসারের যথেচ্ছার খামখেয়ালিপনা। তিনি হয়তো শিক্ষা প্রসারের বিরুদ্ধে। তাই তো ছাত্রছাত্রী আর গরু-ছাগলকে একই স্থানে পাঠদানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি এখন বামনা উপজেলায় নেই। কিন্তু যাওয়ার আগে কয়েকজনের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে গেছেন। এখন সেই মিথ্যা মামলায় নিরীহ ব্যক্তিরা হয়রানির শিকার। তিনি কেন এতটা নাখোশ বিদ্যালয়ের ওপর? তিনি কি চান তিনি একাই বিদ্বান থাকবেন আর সবাই ছাগল-গরু থাকুক? না হলে তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে আদালতের রায় উপেক্ষা করার এত দুঃসাহস পান কিভাবে? তিনি কি জানতেন না, ওই বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি কে? তিনি আর কেউ নন। বাংলা সাহিত্যের অনন্য কথাসাহিত্যিক বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক সেলিনা হোসেন। বর্তমানে সেলিনা হোসেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান। যাঁকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সম্মান করেন। অথচ উপজেলার একজন নির্বাহী অফিসার তাঁকে নানাভাবে হেনস্তা করছেন। আমরা এই অমানবিক হেনস্তার অবসান চাই। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

লেখক : গল্পকার ও নাট্যকার